র‍্যান্ডম হার্টস ১৯৯৯-এর হলিউড ছবি। মূল অভিনেতা হ্যারিসন ফোর্ড আর ক্রিস্টিন স্কট থমাস। ডাচ ভ্যান ডেন ব্রক (অভিনেতা হ্যারিসন ফোর্ড) পুলিশ সার্জেন্ট, তার স্ত্রী পিটন (অভিনেতা সুজানা থম্পসন), সুখী তাদের বিবাহিত জীবন। এক আদুরে সকালে পিটন মায়ামি রওনা হল, কাজে। তখন কিছু বোঝাই যায়নি। পরে সংবাদ এল প্লেন-ক্র্যাশের। মায়ামিগামী প্লেন টেক-অফ করেই ভেঙে পড়েছে সমুদ্রে। যাত্রীদের একজনও বাঁচেনি।

খোঁজ নিতে গিয়ে আবিষ্কার করল ডাচ, যাত্রী-তালিকায় তার স্ত্রী-র আসল নাম নেইই মোটে। পিটন টিকিট কেটেছিল অন্য নামে, অন্য এক পুরুষের স্ত্রী হিশেবে। খুঁজতে খুঁজতে ডাচ এবার পৌঁছল ওই দ্বিতীয় পরিবারে — মৃত পুরুষ কালেন শান্ডলার (অভিনেতা পিটার কয়টে) এবং তার স্ত্রী, এখন-বিধবা কে (অভিনেতা ক্রিস্টিন স্কট থমাস)। কে পেশায় নিউ-হ্যাম্পশায়ারের রাজনীতিবিদ। ডাচ খুঁজে পেতে শুরু করল অনেক কিছু, কে-র দাম্পত্য টেনশনাক্রান্ত জীবন, কে-র সঙ্গে কে-র মেয়ের সম্পর্কের জটিলতা, কালেন শান্ডলার আর পিটনের এতদিনকার প্রেম ও অভিসার, ইত্যাদি। ক্রমে একই রক্তপাতে রক্তাক্ত দুই মানুষ, ডাচ আর কে, দুজনে কাছাকাছি আসতে থাকে, নতুন করে শুরু হয় ভগ্নস্তূপে এক নতুন সম্পর্কের পত্তন।

আমরা এই র‍্যান্ডম হার্টস-এর একদম শুরুটুকু, মৃতদেহ আবিষ্কারটুকু, ব্যবহার করেছি আমাদের এই আখ্যানে। তার পর থেকে, এমনকি তার আগে থেকেই, আমাদের আখ্যানটা আমাদের, র‍্যান্ডম হার্টস-এর সঙ্গে তার কোনো সম্পর্কই নেই। এবং, এটা করার সময়, আমাদের আখ্যানে, ফিল্মাগত একমাত্র চরিত্র হ্যারিসন-কে যে হ্যারিসন বলে ডেকেছি, ডাচ ভ্যান ডেন ব্রক বা ডাচ বলে নয়, তার কারণ, এখানে আমরা ডাচ-কে ভাবছি না একদমই। ভাবছি হ্যারিসন পারসোনা-টাকে। অভিনীত চরিত্র এবং স্টার-অভিনেতার মিলিত ইমেজ বা ছবিটাকে।

আখ্যানটা লেখাকালীন দেখছিলাম, ডাচ নামটা ভাবতে গেলেই অস্বস্তি লাগছে, হ্যারিসন-টাই ঠিক বলে মনে হচ্ছে। তার একটা আংশিক কারণ এটা হতে পারে যে, কোনো একটা জনপ্রিয় অ্যাকশন ফিল্ম সিরিজে একজন সুপারস্টারের নাম ছিল ডাচ। হয় র‍্যাম্বো সিরিজের স্ট্যালোন, বা ডাই-হার্ড সিরিজের ব্রুস উইলিস, অথবা হংকং সিরিজের জাঁ ক্লদ ভ্যানড্যাম, এখন ঠিক মনে পড়ছে না। কিন্তু এর চেয়ে অনেক বড় কারণ এই পারসোনার ব্যাপারটা। আখ্যানটা শেষ করার পর মনে

অনেক বড় কারণ ওই পারসোনার ব্যাপারটা। আখ্যানটা শেষ করার পর মনে হয়েছে, এই আখ্যানের ঘটনাধারায় বরং ছায়া ফেলে থাকবে হ্যারিসন ফোর্ডেরই এয়ারফোর্স-ওয়ান বা ব্লেড-রানার। এয়ারফোর্স-ওয়ানে এই আখ্যানের সঙ্গে প্রায় সমান্তরাল একটা খুন ছিল, একজন অপটু টেররিস্টকে যখন মেরে দিয়েছিল ইউ-এস প্রেসিডেন্ট চরিত্রে অভিনেতা হ্যারিসন ফোর্ড। বা, ব্লেড-রানারের অফিসারের ওই তিক্ত নির্মম বিষণ্ণতা। এই হ্যারিসন পারসোনাটাই আমাদের মূল চরিত্র। র‍্যান্ডম হার্টস-এর ডাচ নয়।

তাই, এই আখ্যানে, সহজেই হ্যারিসনের প্রতিতুলনায় চলে আসে অন্য পারসোনারা। লিভিং-লাস-ভেগাস থেকে নিকোলাস কেজ, বা লাস্ট-অ্যাকশন-হিরো থেকে আর্নল্ড শোয়ার্জনেগারের কথোপকথন। বা, গুলাম-এ-মুস্তাফার নানা পাটেকর, যার প্রেমিকা, বারনর্তকী রবিনা মারা গেছিল কাকতালীয় ভাবে, একটা ভুল জায়গায় ভুল কন্টেক্সটে ফেটে যাওয়া বিস্ফোরকে, যা লাগিয়েছিল সেই আন্ডারওয়ার্ল্ড, যার অংশীদার নানা নিজেই। আমাদের মনোভূমির আখ্যানে বাস করে এই পারসোনারাই। মার্লন ব্রান্ডোর কটা সিনেমার মূল চরিত্রটার নামটুকুও মনে আছে আপনার? বা, উত্তমকুমারের? এক, অ্যান্টনি ফিরিঙ্গির অ্যান্টনি ছাড়া? ফিল্মের আখ্যান এভাবেই বেঁচে থাকে আমাদের মাথায়। সেই পারসোনা হ্যারিসন এই আখ্যানের নায়ক।

দুর্ঘটনার খবরটা যখন এল, হ্যারিসন তার মিনিট তিরিশেক আগেই ঘুম থেকে উঠে আগের রাতের অত্যধিক মদ্যপানের খোয়াড়ি কাটাচ্ছে। শুধু মদের না, মেনে নিতে হওয়ার, অথচ কিছুতেই মেনে নিতে না-পারার খোয়াড়িও। যদি নিঁখুত অবিকল হুবহু পুলিশ হয়ে উঠতে না-পারে, তাহলে যে কোনো পুলিশেরই যেমনটা ঘটার কথা।

কিন্তু অন্য দিনের মত আজ মুহুর্মুহু মুখখিস্তি করছিল না হ্যারিসন ফোর্ড। বরং, বেশ কোমল লাগছিল তার। বেশ একটা মজাও। মুখে একটা আলতো হাসিও ছড়াচ্ছিল। বৌ কিছু টেরও পাবে না, বৌয়ের জানার আগেই বিবাহবার্ষিকীর উপহারটা কিনে আনতে পারবে। বরঞ্চ, সেদিক থেকে, অফিসের কাজে বৌয়ের এবারের বাইরে যাওয়াটা পছন্দই হয়েছিল হ্যারিসনের। সমস্ত যাবতীয় ক্লান্তির এবং বিরক্তির পরেও একটা আদুরে মজা ছড়িয়ে থাকছিল বাতাসে।

আসলে বাস্তবতার আবহটা বোধহয় তৈরি হয়ে চলছিল, যাতে সবচেয়ে নাটকীয় বেদনার প্রেক্ষিতে

ফুটে উঠতে পারে দুর্ঘটনাটা, দুর্ঘটনার সংবাদটা ফুটে উঠতে পারে সবচেয়ে স্পষ্ট ঔজ্জ্বল্যে, যে, যার ফেরার কথা, সে আর কোনো দিনই ফিরবে না। ফিল্মে যেমন হয়ে থাকে। এই গোটাটাই তো ঘটছিল একটা ফিল্মের মধ্যে।

ফিল্ম মানেই তো এলিগান্ট নারীদের দিয়ে বিবিধ এলিগান্ট কাজকম্মো করানো, ব্রুফো না কে বলেছিল। আর, লাস্ট অ্যাকশন হিরো সিনেমায়, ম্যাজিক টিকিট দিয়ে সিনেমা হলের সিট থেকে সরাসরি সিনেমার মধ্যে ঢুকে আসা বালকটি নায়ক শোয়ার্জনেগারকে বলেছিল, দেখছ না, চারদিকে প্রতিটি নারীই কি এলিগান্ট, এ কখনো সিনেমা না-হতে পারে?

অথচ, এটা সিনেমা হওয়া সত্ত্বেও, সমুদ্রে ভেঙে পড়া প্লেনের গর্ভে বহু বহু ঘন্টা শীতজলের সান্নিধ্যে কুঁকড়ে যাওয়া চামড়ার নারীশবদেহটাকে একটুও এলিগান্ট লাগছিল না। আসলে রিয়ালিজমের দায় তো একটা থাকেই, আরো, বিগ বাজেট সিনেমায়। আমাদের তা নেই। তাই, আসুন, এলোমেলো হৃদয়ের, র‍্যান্ডম হার্টের সমস্যার ইতিহাসে আকীর্ণ নারীটিকে আমরা এখন মায়াবি মূর্ছনায় থৈ থৈ করে তুলি। সদ্য স্নান সেরে উঠে আসা ঢলোঢলো তার এক মুখ লাবণ্যে আলতো খুব আলতো করে আঙুল ছোঁয়ায় হ্যারিসন ফোর্ড, যেমন আলতো করে এইমাত্র ঘুমোনো বাচ্চার মুখ থেকে সরিয়ে দিতে হয় হঠাৎ এলোমেলো হাওয়ায় উড়ে আসা চুল, তার ঘুম ভেঙে গেল না তো?

যেন এই প্রথম সে দেখল, প্রথমবার, এই মুখ এই ম্যাজিক। কেন? কী আছে এই মুখে যে দেখা মাত্রই আকাশ মাটি জল এক হয়, হিমালয়ের স্ফটিকচূড়া ফাটিয়ে বার হয়ে আসে সপ্তরঙ রামধনু? সৌরজগতের সমস্ত মায়া এসে ভিড় করে চোখে, চোখ বদলে যায় তার, এখন এই চোখ আর তার নয়, লাস ভেগাস ছেড়ে আসার বিষণ্ণতাদীপ্র এই চোখ নিয়ে তাকাতে জানে শুধু নিকোলাস কেজ।

আসলে যেমন হয়, ভালবাসার ম্যাজিক এভাবেই মানুষকে জাগতিক থেকে মহাজাগতিক করে। গুলাম-এ-মুস্তাফায় বাজারি নাচ-বালিকা থেকে নানা পাটেকরের সব আবেগের আশ্রয় হয়ে ওঠা রবিনা দুর্ঘটনায় মারা গেছিল, তারপরেই চেনা পৃথিবীটা বদলে গেছিল নানার। তাকে এবার পৃথিবীর সব ভালবাসাকে ভালবাসতে হয়েছিল। নিজের জীবন দিয়ে নানাকে এবার অন্যদের বাঁচাতে হয়েছিল। আসলে অন্যরাই বাঁচিয়েছিল নানাকে। রবিনোপম ম্যাজিকতায় পৌঁছনোর সিঁড়ি তারা। সেই সিঁড়ি বেয়েই ঝিলমিল আলো জ্বলা স্বর্গে রবিনা নামের কিন্নরীর কাছে পৌঁছতে পেরেছিল নানা। শরীরী পিছুটান নিয়ে অশরীরি অলৌকিক সেই যাদুতে পৌঁছনো যায় না।

হ্যারিসন ফোর্ডও এখন থেকে বদলে যেতে থাকবে। কাল অব্দি যে পাপবোধ তার কাছে ছিল পেশাগত পীড়ন, অকুপেশনাল হ্যাজার্ডের অংশ, আজ সেটাই তার অসহ্য বোধ হল। ঠিক যেরকম সশব্দ হিংস্রতায় তার এক সহকর্মী গুলি করে মেরে দিয়েছিল একটি অপরাধের একমাত্র সাক্ষীকে, হিংস্রতাটা সেই একই ছিল, কিন্তু সাইলেন্সার থাকায় শব্দটা ছিল না। এবং ব্যতিক্রম ছিল একটা

হিংস্রতাটা সেই একই ছিল, কিন্তু সাইলেন্সার থাকায় শব্দটা ছিল না। এবং বাড়তি ছিল একটা উদাসীন শৈত্য। হ্যারিসন এবার মেরে দিয়েছিল তার ওই সহকর্মীকে, সদ্যনিহত একটি আন্ডারওয়ার্ল্ডীর হাতের রক্তমাখা বন্দুকে রুমাল জড়িয়ে।

লো-কি লো-প্রোফাইল আন্ডার-অ্যাক্টিং আচরণবিধির মধ্যে মৃদু উচ্চকিত একটা ঝলক — একটা অস্পষ্ট অব্যক্ত গালি দিল হ্যারিসন, রুমালটার দিকে চোখ পড়ে — আবার তাকে এটা কেমিকালে ভেজাতে হবে, একবার, দুবার, তারপর কেচে নিতে হবে। এই রুমালটা সে ফেলতে পারবে না। যে এটা দিয়েছিল, সে আর নেই। এবং হ্যারিসন খুব ভালই জানে, অসাবধান হওয়ার কোনো মানেই হয় না। হ্যারিসনের পেশাই হ্যারিসনকে শিখিয়েছে, দেয়ার ইজ নো পারফেক্ট মার্ডার, নিখুঁত খুন করা যায় না। ক্লু থাকবেই, সেই ক্লু মিটিয়ে দাও, মুছে দাও। পুলিশ হওয়ার বাড়তি সুবিধে এটাই, সাধারণ খুনীদের যেটা থাকে না।

মুখ খারাপ করার পরের মুহূর্তেই খারাপ লাগল হ্যারিসনের। তার সহকর্মীর হাতে খুন হওয়া নির্দোষ মানুষটির মেয়েটি, কাল করুণ মাথা-ভর্তি-কোঁকড়ানো-চুল মেয়েটি, তার খুব কাছেই দাঁড়িয়ে ছিল। এই মেয়েটিকে বাঁচাতেই নিজের সহকর্মীকে মেরে ফেলতে হল হ্যারিসনের। অপরাধের সাক্ষী তার বাবার খুনের একমাত্র সাক্ষী এই মেয়েটি। ওই পুলিশ অফিসার এটা জানে। তাই ওই অফিসারকে না-মারলে এবার মেয়েটিও খুন হবে, স্বাভাবিক ভাবেই, আন্ডারওয়ার্ল্ড আর পুলিশের মিলিত আন্ডারওয়ার্ল্ডের অস্বিত্বের লজিক বেয়েই গজিয়ে উঠবে খুনটা, খুন মেয়েটাকে হতেই হবে। খুনী হিশেবে পুলিশ খুব নিশ্চিত এবং অব্যর্থ, হ্যারিসন নিজেই তার প্রমাণ। মেয়েটির সামনে মুখ-খারাপ করেই খুব খারাপ লাগল হ্যারিসনের। বিমান-দুর্ঘটনাটা না-ঘটলে, আর কদিন বাদে, এরকম একটা মেয়ে তার নিজেরই হতে পারত, সেই মেয়ের কি ভাল লাগত তার বাবাকে এফ-ওয়ার্ড বলতে শুনলে? গালি দিয়ে ফেলার অস্বস্তিটা ঢাকতে, মেয়েটির দিকে তাকিয়ে একটু বোকা হাসল হ্যারিসন।

ও হ্যাঁ, ওই উদাসীন শৈত্য। খুন করার পুরো সময়টা জুড়ে হ্যারিসনের শরীরী সঙ্কেতে, বডি ল্যাংগুয়েজে এটা ছিল। এবং এটা হ্যারিসনের বাড়তি। সাক্ষীকে, মেয়েটির বাবাকে মারার সময় ওর সহকর্মী অফিসারের এটা ছিল না। থাকা সম্ভবই ছিল না আদৌ। আন্ডারওয়ার্ল্ডের পোষা স্বাভাবিক পুলিশের দৃষ্টি জুড়ে লোভ নড়ে, টাকার জিনিসের বিলাসের। উদাসীন সে হবে কী করে? ওই শৈত্যের জন্যে একটা নিহিত লাগে। নিজের জীবনকে প্রদত্ত বাস্তবতার থেকে অনেকটা আলাদা করে তুলতে তুলতে যে আত্মবিশ্বাসটা তৈরি হয়। আন্ডারওয়ার্ল্ডের আদেশের বাইরে, নিজে, তাও আবার ঘুষ না চুরি না, সম্পূর্ণ নিজে সম্পূর্ণ অন্য কিছু একটা করব, একজন পুলিশ আর কী ভাবে এর চেয়ে বড় করে নিজের বাস্তবতা থেকে নিজেকে আলাদা করে তুলতে পারে? হ্যারিসন সেটাই

করছিল এখন।

করছিল এখন।

কিন্তু, এই আখ্যানটায় একটা সমস্যা ঢুকে যাচ্ছে। লেখকের ডিরেক্ট ইনভলভমেন্ট, প্রত্যক্ষ প্রবেশ। আগের প্যারার শুরুতেই দেখুন, লেখক যেন বসে আছে, শৈত্যের প্রসঙ্গটায় ফেরত নিয়ে গেল। এছাড়া, আখ্যানে বিবৃত বাস্তব সময়টাও যারপরনাই ঘেঁটে গেছে। সংশোধন করে নেওয়া যাক। এই খুনের ব্যাপারটা ঘটছে আখ্যানের মাঝামাঝি গিয়ে। তার আগে এবং পরে আছে আরো কিছু ঘটনা। সহকর্মীকে এই খুন করাটা বরং হ্যারিসনের জীবনের একটা অঙ্কবদলকে চিহ্নিত করবে। অন্য রকম একটা ক্রিয়া। যার কিন্তু একটা ইতিহাস ছিল। অন্য ভাবে ভাবার একটা অন্যরকম মনোপ্রক্রিয়া। যে অন্য রকম চিন্তা ছাড়া অন্য ক্রিয়ায় পৌঁছনো যায় না। এই ইতিহাসটা আখ্যানে এখনো বলিনি আমরা। যে ইতিহাস বেয়ে বদলটা এসেছিল, সেই গভীর ব্যাপক বদলেরই একটা ছোট্ট উপনির্মাণ ওই গজিয়ে ওঠা আত্মবিশ্বাসটাও। চিন্তাবদলের ইতিহাসটাকে বুঝতে, আসুন আমরা ফেরত যাই, আর এক বার, জলপ্রত্যাগত নারীশরীরটির সামনে দাঁড়িয়ে থাকা হ্যারিসনের মাথায়।

এই নারীটি, এতগুলো বছর তার সমস্ত আবেগ যাকে ঘিরে জেগেছে ঘুমিয়েছে, যার চোখের পাতার নড়াচড়ায় সে সূর্যোদয় আর সূর্যাস্ত দেখেছে, আর নড়বে না সেই চোখের পাতা, সজল হবে না কখনো, আহত খর দৃষ্টিতে তাকাবেও না। একটা সময়রিক্ততার মধ্যে দাঁড়িয়ে সদ্য স্নান সেরে উঠে আসা যেন সেই ঢলোঢলো এক মুখ লাবণ্যের দিকে তাকিয়েছিল হ্যারিসন। আর তার মস্তিষ্কের একটা অংশ খুঁড়ে চলেছিল ঘটনাধারাটা। এখন থেকে একটা দীর্ঘ সময় জুড়ে সে খুঁড়েই চলবে।

অন্য নাম, অন্য পুরুষ, অন্য যাত্রা — অফিসের কাজে নয়, নিজের কাজে। সম্পূর্ণ নিজের কাজে যাচ্ছিল বৌ। একান্ত নিজের। হ্যারিসন আর তার, দুজনের মিলিয়ে নিজের নয়। এরকম কাজ ছিল তাহলে বৌয়ের। কী ছিল? কতটা ছিল? খুঁড়েই চলল হ্যারিসন, আর এটাই তো তার পেশা। সবই পেয়ে গেল সে একটু একটু করে। দীর্ঘ আট বছর ধরে বৌয়ের বেশিরভাগ ট্যুরই ছিল এই ব্যক্তিগত যাত্রা। সেই যাত্রাস্থলগুলো এবার এক এক করে চিনল হ্যারিসন। চিনল সেই একই দুর্ঘটনায় সহনিহত, বৌয়ের সহযাত্রী সেই পরপুরুষটিকেও। তার পরিবার, তার বাস্তবতা।

সব জানার পর, এবার কী করে হ্যারিসন? চিত্রনাট্য এখন কী চায়? কী করতে পারে সে?

মাথায় রাখবেন, তদন্তের খোঁড়াখুঁড়ির এই দীর্ঘ প্রক্রিয়াটা চলতে চলতেই, ইতিমধ্যেই, ওই খুনটা কিন্তু ঘটে গেছে। ঘটে গেছে চিন্তার আর ক্রিয়ার ওই অঙ্কবদল। পৃথিবীটা একই থেকেই অন্যরকম হয়ে যেতে শুরু করেছে হ্যারিসনের। ভাবে হ্যারিসন, খুব ভাবে আজকাল। একা মানুষ এখন সে। খাদ্যের হিমপ্যাকেট পারমানবিক করতে, মাইক্রোওয়েভে নিউক করতে, দেওয়া এবং বার করাই প্রায় তার একমাত্র সংসারযাত্রা। তাই সময় তার হাতে প্রচুর, অনেক ভাবে হ্যারিসন। আর কিছু তো তেমন করার থাকে না তার।

করার থাকে না তার।

বৌ কি তাকে ঠকিয়েছে? যে ঠকানোটা ধরা পড়ে গেল এই দুর্ঘটনায়? সত্যিই ঠকিয়েছে? কিন্তু ঠকানোটা জানার আগে অব্দি বৌকে কখনো না-বৌ বলে তো মনে হয়নি? তাহলে ঠকাল কোথায়? একটা বিয়ে থেকে যা যা পাওয়ার কথা ছিল হ্যারিসনের, যা যা সে পাওয়ার কথা ভাবত, তাতে কোনো ফাঁক ফাঁকি বঞ্চনা যদি সে অনুভব করত, তাহলে তো বিয়ে বলেই মনে হত না, বৌকে আর বৌ-ই লাগত না। তাহলে তো আলাদা করে কোনো ব্যথা দিত না ঠকানোটা, সেটা কোনো ঠকানোই হত না। না-বৌ কী করে বৌ হিশেবে ঠকায়? বৌ হিশেবে কোনো ঠকানো ছিল না বলেই এটা একটা ঠকানো হয়ে উঠতে পেরেছে।

আরো ভাবে হ্যারিসন। বৌ তাকে ঠকাল কেন? অধিকতর টাকা, নিরাপত্তা, স্বস্তি — এইসবের জন্যে? কিন্তু, তাই যদি হয়, তাহলে তো ঠকানোটা অন্য জায়গায় এবং আগে থেকেই। তার মানেই তো, পরপুরুষের সঙ্গে ওই ব্যক্তিগত যাত্রায় আলাদা করে কোনো ঠকানোই ছিল না। আর এই টাকা নিরাপত্তা স্বস্তি এসব তো যথেষ্টই ছিল বৌয়ের। নিজেরই। তাহলে ঠকাবে কেন? সে, হ্যারিসন এটা জানলে দুঃখ পাবে বলে? কিন্তু তার মানে তো বৌ তাকে ভালবাসত। তার মানে ঠকানোটা কোনো ঠকানো ছিল না? এর পরেও যদি কোনো ঠকানো থেকে থাকে, সেটা পরপুরুষের সঙ্গে সেক্স করতে চাওয়ায়। সেটা যদি ঠকানো হয়, তাহলে, অন্য কোনো পুরুষের প্রতি এক মুহূর্তের একটা কামনাও একই রকমের ঠকানো।

আর, খেয়াল রাখবেন, অন্য একটা যাত্রা, অন্য রকম একটা চিন্তাপ্রক্রিয়া ইতিমধ্যেই শুরু হয়ে গেছে হ্যারিসনের। একটা উলট-পুরান। খুন যখন এড়ানো যায় একমাত্র খুন করেই। প্রহরীকে যখন গুপ্তঘাতক হতেই হয়, যদি সে এককণাও প্রহরী থাকতে চায়। নিজের জীবনের গোটা আখ্যানটাই এবার তাই উল্টে দেয় হ্যারিসন।

হ্যারিসনের বুকের গভীরে বৌ একদম একই রকম বৌ রয়ে যায়। আবার হ্যারিসন তো সত্যনিষ্ঠ প্রহরীও। তার পেশাটাই তাই। তাই যা ঘটনা তাকে তো সে অস্বীকারও করতে পারে না। সদ্য জলোদ্গত বৌয়ের মৃতদেহের সেই ঢলোঢলো মুখের ছবিটা, পুলিশ ফাইল থেকে বার করে একটা ফোটোকপি করে হ্যারিসন। আগে যে ফ্রেমে তাদের জোড়ের ছবি ছিল, সেখানে সেটা লাগিয়ে বিছানার মাথার কাছে টেবিলে রেখে দেয়। ঘুমোতে যাওয়ার আগে, সারাদিনের কাজ শেষে ফিরে এসে, বৌয়ের কাছে পৌঁছে, ওই ছবিতে চুমু খায় হ্যারিসন। আবার চুমু খাবে। ঘুম থেকে উঠে। ঘুম থেকে স্বপ্ন থেকে বৌয়ের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে সারাদিনের কাজে যাওয়ার আগে। যেমন আগেও অভ্যেশ ছিল হ্যারিসনের। তাই, বৌ আজো একই ভাবে আছে, হ্যারিসনের সঙ্গেই।

সবই খুব সুন্দর, খুব ঠিকঠাক চলছে। শান্ত স্থির উন্মুক্ত। এবং অতর্কিতে বদলে যাওয়ার টেনশনহীন

সবই খুব সুন্দর, খুব ঠিকঠাক চলছে। শান্ত স্থির উন্মুক্ত। এবং অতর্কিতে বদলে যাওয়ার টেনশনহীন রকমে সুন্দর। একবার একটা আদুরে মিষ্টি সকাল থেকে বিদায় নিয়ে অজানা যাত্রায় গিয়ে আচম্বিতে মরে গেছে। একবার মরে গেছে বলেই আর তো মরে যেতে পারবে না। সবকিছুই এত সুন্দর হয়ে যাওয়ায়, মাঝে মাঝে হ্যারিসনের মনে হয়, প্লেন ভেঙে সমুদ্রে পড়ার কোনো টেররিস্ট চক্রান্তে তার নিজেরই হাত ছিল না তো?